

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নবী চরিত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(أَخْلَاقُ الرَّسُولِ صِدْقٌ وَخُصُوصِيَّاتُهُ) -এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাদুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন (বুখারী হা/৭)। আল্লাহপাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ‘নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী’ (ক্বলম ৬৮/৮)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ‘আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য’।[১] তাই দেখা যায়, নবুঅত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সহমর্মিতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে’ (আহযাব ৩৩/২১)। তাঁর অনুপম চরিত্রমাদুর্য ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ণভাবে বর্ণনা করা ঐরূপ অসম্ভব, যে রূপ পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করা এবং খালি চোখে আকাশের তারকারাজি গণনা করা অসম্ভব। তবুও দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু চারিত্রিক নমুনা ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হ’ল।-

(১) বাকরীতি (تعبير الكلام) : তিনি হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দরভাবে কথা বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত। আর একেই লোকেরা ‘জাদু’ বলত। তাঁর উন্নত ও শুদ্ধভাষিতায় মুগ্ধ হয়েই ইয়ামনের যেমাদ আযদী মুসলমান হয়ে যান।[২] নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ‘তিনি ছিলেন আরব ও অনারবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ’।[৩] এমনকি ‘হাদীছ জাল হওয়ার অন্যতম নিদর্শন হ’ল তার শব্দসমূহের উচ্চ মানবিশিষ্ট না হওয়া’ (ফাৎহুল মুগীছ)। একারণেই আরবী সাহিত্যে কুরআন ও হাদীছের প্রভাব সবার উপরে। বরং বাস্তব কথা এই যে, এই ভাষার বুকে কুরআন ও হাদীছের অবস্থানের কারণেই তা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ বাকরীতি ও আলংকরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হ’তে পেরেছে এবং ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। অথচ হিব্রু, খালেদী, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা সমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্তির পথে।

(২) ক্রোধ দমন শৈলী (أسلوب كظم الغيظ) : ক্রোধ দমনের এক অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি বলতেন, প্রকৃত বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমন করতে পারে।[৪] আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি কখনো কাউকে নিজের স্বার্থে নিজ হাতে মারেননি। কোন মহিলা বা খাদেমকে কখনো প্রহার করেননি’।[৫]

(৩) হাসি-কান্না (الضحك والبكاء) : তিনি মৃদু হাস্য করতেন। কখনোই অট্টহাস্য করতেন না। সদা প্রফুল্ল

থাকতেন। কখনোই গোমড়ামুখো থাকতেন না। তবে দুশ্চিন্তায় পড়লে তার ছাপ চেহায়ায় পড়ত এবং তখন তিনি ছালাতে রত হ'তেন।[6] ছোটখাট হালকা রসিকতা করতেন। যেমন, (ক) একদিন স্ত্রী আয়েশার নিকটে এসে তার এক বৃদ্ধা খালা রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে অমুকের মা! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একথা শুনে উক্ত মহিলা কাঁদতে শুরু করল। তখন আয়েশা বললেন, তাদের কি দোষ? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি কুরআনে পড়োনি যে আল্লাহ বলেছেন, **إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنثَاءً۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔** 'আমরা জান্নাতী নারীদের বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি'। 'অতঃপর তাদের চিরকুমারী করেছি'। সদা সোহাগিনী, সমবয়স্কা'। 'ডান সারির লোকদের জন্য' (ওয়াফি'আহ ৫৬/৩৫-৩৮)।[7] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সবাই ৩০ থেকে ৩৩ বছর বয়সী হবে'।[8]

(খ) এক সফরে তিনি দেখেন যে, মহিলাদের নিয়ে তাঁর কৃষ্ণকায় উষ্ট্রচালক গোলাম আনজাশাহ দ্রুত গতিতে উট হাঁকিয়ে চলেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, **رُؤْيُكَ يَا أُنْجَشَةُ، لَا تَكْسِرُ الْقَوَارِيرَ**, 'ধীরে চালাও হে আনজাশা! কাঁচের পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেল না'।[9] (গ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সঙ্গে মিশতেন। এমনকি আমার ছোট ভাই আবু ওমায়ের একটি 'নুগায়ের' অর্থাৎ লাল ঠোঁট ওয়ালা চডুই জাতীয় পাখি পুষত। যা নিয়ে সে খেলা করত। রাসূল (ছাঃ) যখন এসে তাকে খেলতে দেখতেন, তখন বলতেন, **يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ**, 'হে আবু ওমায়ের! কি করছে তোমার নুগায়ের?'[10]

ছালাতের মধ্যে বিশেষ করে তাহাজ্জুদের ছালাতে তিনি আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে তার অন্তর কেঁদে উঠতো এবং তার অভাব দূরীকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। চাচা হামযা, কন্যা যয়নব ও পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে তিনি শিশুর মত হু হু করে কেঁদেছিলেন। তিনি অন্যের মুখে কুরআন শুনতে পসন্দ করতেন। একবার ইবনু মাসউদের মুখে সূরা নিসা শুনে তাঁর চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়। অতঃপর ৪১ আয়াতে পৌঁছলে তিনি তাকে থামতে বলেন।[11]

(৪) বীরত্ব ও ধৈর্যশীলতা (الشجاعة والصبر) : কঠিন বিপদের মধ্যেও তিনি দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ধৈর্যশীল থাকতেন। মাক্কী জীবনের আতংকময় পরিবেশে এবং মাদানী জীবনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মধ্যেও তাঁকে কখনো ভীত-বিহবল ও অধৈর্য হ'তে দেখা যায়নি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঘনঘোর যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থাকতেন (আহমাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ)। শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার কোন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই। অভাবে-অনটনে, দুঃখে-বেদনায়, সর্বাবস্থায় তিনি কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করতেন। এমনকি তিনদিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে সৈন্যদের সাথে অবর্ণনীয় কষ্টে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিলেও চেহায়ায় তার প্রকাশ ঘটতো না। বরং সৈন্যদের সাথে আখেরাতের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই খুশীমনে নিজ হাতে খন্দক খুঁড়েছেন। শত্রুদের শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পেত তাঁর ধৈর্যশীলতা ততই বেড়ে যেত। ওহোদ ও হোনায়েন যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও অসম সাহসিকতা ছিল অচিস্তনীয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। এসময় তাঁর উপর মোটা জরিদার একটি নাজরানী চাদর শোভা পাচ্ছিল। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এমন হেচকা টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুক দিয়ে গিয়ে পড়েন। এতে আমি দেখলাম যে, জোরে টান দেওয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর ঘাড়ের উপর চাদরের দাগ পড়ে গেল। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর মাল যা তোমার কাছে আছে, তা থেকে

আমাকে দেবার নির্দেশ দাও (يَا مُحَمَّدُ مَرِّ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ) তখন রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন ও হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দিলেন। [12]

উক্ত ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় ধৈর্য ও দানশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

(৫) সেবা পরায়ণতা (عِيَادَةُ الْمَرْضَى) : কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে সেবা করতেন ও সাহায্য দিতেন। তার জন্য দো‘আ করতেন। কি খেতে মন চায় শুনতেন। ক্ষতিকর না হ’লে তা দেবার ব্যবস্থা করতেন। নিজের ইহুদী কাজের ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে সাহায্য দেন ও পরিচর্যা করেন। এ সময় তিনি বলেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। তখন ছেলেটি তার বাপের দিকে তাকাল যে তার নিকটে বসা ছিল। বাপ তাকে বলল, أَطْعِ أَبَا الْفَاسِمِ ‘তুমি আবুল ফাসেম-এর কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল। এরপর রাসূল (ছাঃ) বের হবার সময় বললেন النَّارُ مِنَ النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ ‘আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন’ [13]

(৬) সহজ পন্থা অবলম্বন (اِتِّخَاذُ الطَّرِيقَةِ السَّهْلَةِ) : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে যখনই দু’টি কাজের এখতিয়ার দেওয়া হ’ত, তখন তিনি সহজটি বেছে নিতেন। যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকত। তিনি নিজের জন্য কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু আল্লাহর জন্য হ’লে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তেন না’ [14] ওয়ায-নছীহত করতেন, যতক্ষণ না মানুষ বিব্রতবোধ করে [15] নফল ছালাত চুপে চুপে আদায় করতেন, যাতে অন্যের কষ্ট না হয়। তিনি বলতেন, فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ‘তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের সাথে কুলায়’ [16]

(৭) দানশীলতা (الْجُود) : যতক্ষণ তাঁর কাছে কিছু থাকত, ততক্ষণ তিনি দান করতেন। রামাযান মাসে তা হয়ে যেত الْمُرْسَلَةُ الْكَارِجُ ‘প্রবহমান বায়ুর মত’। তিনি ছাদাফা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু হাদিয়া নিতেন। অথচ তা নিজের প্রয়োজনে যৎসামান্য ব্যয় করে সবই দান করে দিতেন। তিনি বলতেন، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ، ‘কেউ অতক্ষণ প্রকৃত মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না সে অপরের জন্য তাই-ই ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে’ [17] তিনি বলতেন، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّعْ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَدًا، ‘একজন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা কখনো একত্রিত হ’তে পারে না’ [18]

(৮) লজ্জাশীলতা (الْحَيَاءُ) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখতেন। কখনোই অন্যের উপরে নিজের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। তিনি কারুর মুখের উপর কোন অপছন্দনীয় কথা বলতে লজ্জা পেতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا، ‘তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে আমরা বুঝে নিতাম’ [19] কারুর কোন মন্দ কাজ দেখলে সরাসরি তাকে মন্দ না বলে সাধারণভাবে নিষেধ করতেন, যাতে লোকটি লজ্জা না পায়। অথচ বিষয়টি বুঝতে পেরে সে নিজেই সংশোধন হয়ে যায়।

(৯) বিনয় ও নম্রতা (التَّوَاضُّعُ وَالتَّذَلُّلُ) : তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তিনি সবাইকে

মানুষ হিসাবে সমান জ্ঞান করতেন। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করতেন না। তাঁকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়াতে ছাহাবীগণকে নিষেধ করতেন।[20] দাস-দাসীদের নিকটে কখনোই অহংকার প্রকাশ করতেন না। তাদের কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে উহ্ শব্দটি করতেন না। বরং তাদের কাজে নিজে সাহায্য করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ১০ বছর রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমাকে কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত তলব করেননি।[21] অবশ্য তার অর্থ এটা নয় যে, অন্যায় কথা বা কাজের জন্য তিনি কাউকে ধমকাতেন না বা ভৎসনা করতেন না। যেমন তিনি উসামা ও খালেদকে ধমকিয়েছেন এবং তাদের ব্যাপারে তিনি দায়ী নন বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছেন।[22] তিনি সর্বদা আগে সালাম দিতেন ও মুছাফাহার জন্য আগে হাত বাড়িয়ে দিতেন। ছাহাবীগণকে সম্মান করে অথবা আদর করে কখনো কখনো তাদের উপনামে ডাকতেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওহমানকে তার উপনামে ‘আবুবকর’, আব্দুর রহমান বিন ছাখারকে ‘আবু হুরায়রা’ (ছোট বিড়ালের বাপ), আলীকে ‘আবু তোরাব’ (ধূলি ধুসরিত), হুযায়ফাকে ‘নাওমান’ (ঘুম কাতর), অতি সতর্ক ও সাবধানী হওয়ার কারণে আনাসকে ‘যুল উযনাইন’ (দুই কান ওয়ালা), সফরে অধিক বোঝা বহনকারী হিসাবে মুক্তদাস মিহরান বিন ফারুখ-কে ‘সাফীনাহ’ (নৌকা) বলে ডাকতেন।[23] উল্লেখ্য যে, খুশী অবস্থায় উপনামে ডাকা আরবীয় রীতি হিসাবে প্রসিদ্ধ।

(ক) দুগ্ধদায়িনী মা, রোগী, বৃদ্ধ, মুসাফির ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি জামা‘আতে ছালাত সংক্ষেপ করতেন।[24]

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর ‘আযবা’ (الْعُضْبَاءُ) নামী একটা উষ্ট্রী ছিল। সে এতই দ্রুতগামী ছিল যে, কোন বাহন তাকে অতিক্রম করতে পারত না। কিন্তু একদিন এক বেদুঈনের সওয়ারী আযবা-কে অতিক্রম করে গেল। বিষয়টি মুসলমানদের কাছে কষ্টদায়ক মনে হ’ল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ ‘তিনি হ’লেন ইবরাহীম (আঃ)’।[25]

(গ) জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (সৃষ্টির সেরা) বলে সম্বোধন করলে তিনি তাকে বলেন, أَكْرَأُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ‘তিনি হ’লেন ইবরাহীম (আঃ)’।[26]

(ঘ) একবার এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে ভয়ে বিহবল হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাকে বলেন, هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ ‘স্তির হও! আমি কোন বাদশাহ নই। আমি একজন কুরায়েশ মহিলার সন্তান মাত্র। যিনি শুকনা মাংস ভক্ষণ করতেন’।[27] উল্লেখ্য যে, আরবের গরীব লোকেরা শুকনা মাংস খেতেন। এ সকল ঘটনায় বাস্তব জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের ও নিরহংকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

(১০) সংসার জীবনে (فِي حَيَاتِهِ الْعَالِيَةِ) : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন ও কাপড়ে তালি লাগাতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, সংসারের কাজ নিজ হাতে করতেন, নিজে বকরী দোহন করতেন, কাপড় ছাফ করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন’।[28]

স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন কুমারী ও সবচেয়ে কম বয়স্কা। তাই রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো সাথীদের এগিয়ে দিয়ে নিজে তার সাথে দৌড়ে পাশ্চা দিতেন। তাতে আয়েশা জিতে যেতেন। আবার আয়েশা ভারী হয়ে গেলে প্রতিযোগিতায় তিনি হেরে যান’।[29] তাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে বেদুঈন মেয়েদের নাচ-গান শুনেছেন।[30] রাসূল (ছাঃ) যে কত বাস্তববাদী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন, এতে তার প্রমাণ মেলে। খায়বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নব পরিণীতা স্ত্রী ছাফিইয়াকে উটে সওয়ার করার জন্য তিনি নীচু হয়ে নিজের হাঁটু পেতে দেন। অতঃপর

ছাফিইয়াহ নবীর হাঁটুর উপরে পা রেখে উটে সওয়ার হন’।[31]

(১১) সমাজ জীবনে (فى حياته الاجتماعية) : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। নিজের ও স্ত্রী সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করতেন। কারু ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ হ’তে দূরে থাকতেন। পরনিন্দা ও পরচর্চা হতে বেঁচে থাকতেন। সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি শত্রুদের দেওয়া কষ্টে ও মূর্খদের বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করতেন। তিনি মন্দকে মন্দ বলতেন ও ভালকে ভাল বলতেন। কিন্তু সর্বদা মধ্যপন্থী আচরণ করতেন।[32] তিনি সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতেন। তাঁর নিকটে লোকেদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতা (আহমাদ হা/২৩৫৩৬)। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি তাঁর করুণা ছিল সর্বাধিক। তিনি বলতেন, ‘أَبْغُونِي فِي الضُّعْفَاءِ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعْفَائِكُمْ’ ‘তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে তাল্লাশ করো। কেননা তোমরা রুযিপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক দুর্বল শ্রেণীর মাধ্যমে’।[33] অর্থাৎ তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে তোমরা আমার সন্তুষ্টি তাল্লাশ কর।

সমাজ সংস্কারে তিনি জনমতের মূল্যায়ন করতেন। যেমন-

(১) কুরায়েশদের নির্মিত কা’বাগৃহে ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত কা’বাগৃহ থেকে কিছু অংশ ছেড়ে রাখা হয়েছিল। ছাড়া অংশটিকে ‘রুকনে হাফীম’ বলা হয়। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) চেয়েছিলেন ওটাকে ইবরাহীমী ভিতের উপর কা’বাগৃহের মধ্যে শামিল করতে এবং কা’বাগৃহের দু’টো দরজা করতে। কিন্তু জনমত বিগড়ে যাবার ভয়ে তিনি তা করেননি। এবিষয়ে তিনি একদিন আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, الْكَعْبَةُ الْكَافِرُ لِنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ, ‘যদি তোমার কণ্ঠ নও মুসলিম না হ’ত, তাহ’লে আমি কা’বা ভেঙ্গে দিতাম এবং এর দু’টি দরজা করতাম। একটি দিয়ে মুছল্লীরা প্রবেশ করত এবং অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু কুরায়েশরা তা না করে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে। যাতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (৬৪-৭৩ হি.) সেটি করেন’।[34]

(২) তিনি সাধ্যপক্ষে উম্মতের ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করতেন। যেমন মুনাফিকদের অপতৎপরতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওমর ফারুক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকটাকে (ইবনু উবাইকে) শেষ করে দিই। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, না। তাতে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছেন’।[35]

(৩) তিনি লোকদের সাথে নম্র আচরণ করতেন। বৈঠকে তিনি কোনরূপ অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। বেদুঈনদের রুঢ় আচরণে তিনি ধৈর্য অবলম্বন করতেন। বলা চলে যে, তাঁর এই বিনয়ী ব্যবহার ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ‘আর আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ’ত, তাহ’লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)। রাসূল (ছাঃ)-এর এই অনন্য চরিত্র মাধুর্য ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিশেষ দান।

ফুটনোট

[1]. হাকেম হা/৪২২১; ছহীহাহ হা/৪৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

- [2]. মুসলিম হা/৮৬৮ (৪৬); মিশকাত হা/৫৮৬০।
- [3]. মুকাদ্দামা ফাৎলুল মুলহিম শারহ মুসলিম ১৬ পৃঃ।
- [4]. বুখারী হা/৬১১৪; মুসলিম হা/২৬০৯ (১০৭); মিশকাত হা/৫১০৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ২০ অনুচ্ছেদ।
- [5]. মুসলিম হা/২৩২৮ (৭৯); মিশকাত হা/৫৮১৮।
- [6]. আবুদাউদ হা/১৩১৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৭০৩; মিশকাত হা/১৩২৫।
- [7]. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ওয়াক্বি‘আহ ৩৫-৩৮ আয়াত; রাযীন, মিশকাত হা/৪৮৮৮, সনদ ছহীহ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায় ‘ঠাট্টা করা’ অনুচ্ছেদ।
- [8]. তিরমিযী হা/২৫৪৫; আহমাদ হা/২২১৫৯; ছহীহাহ হা/২৯৮৭; মিশকাত হা/৫৬৩৯।
- [9]. বুখারী হা/৬২১১; মুসলিম হা/২৩২৩; মিশকাত হা/৪৮০৬।
- [10]. বুখারী হা/৬১২৯; মুসলিম হা/২১৫০ (৩০); মিশকাত হা/৪৮৮৪ ‘ঠাট্টা করা’ অনুচ্ছেদ।
- [11]. বুখারী হা/৫০৫০; মুসলিম হা/৮০০; মিশকাত হা/২১৯৫।
- [12]. বুখারী হা/৬০৮৮; মুসলিম হা/১০৫৭; মিশকাত হা/৫৮০৩ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।
- [13]. আবুদাউদ হা/৩০৯৫; বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪ ‘জানায়েয’ অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।
- [14]. বুখারী হা/৬১২৬; মুসলিম হা/২৩২৭; মিশকাত হা/৫৮১৭ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।
- [15]. বুখারী হা/৬৪১১; মুসলিম হা/২৮২১; মিশকাত হা/২০৭।
- [16]. বুখারী হা/১৯৬৬ ‘ছওম’ অধ্যায়-৩০ ‘ছওমে বেছালে বাড়াবাড়ির শাস্তি’ অনুচ্ছেদ-৪৯।
- [17]. বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫ (৭২); মিশকাত হা/৪৯৬১ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ।
- [18]. তিরমিযী হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।

- [19]. বুখারী হা/৬১০২; মুসলিম হা/২৩২০; মিশকাত হা/৫৮১৩ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।
- [20]. তিরমিযী হা/২৭৫৪; মিশকাত হা/৪৬৯৮।
- [21]. বুখারী হা/৬০৩৮; মুসলিম হা/২৩০৯; মিশকাত হা/৫৮০১।
- [22]. মুসলিম হা/৯৬; বুখারী হা/৪৩৩৯।
- [23]. আবু হুরায়রা (তিরমিযী হা/৩৮৪০); আবু তোরাব (বুখারী হা/৬২০৪); নাওমান (মুসলিম হা/১৭৮৮ (৯৯); যুল-উয়নাইন (আবুদাউদ হা/৫০০২; তিরমিযী হা/১৯৯২; মিশকাত হা/৪৮৮৭); সাফীনাহ (আহমাদ হা/২১৯৭৮, সনদ হাসান; হাদীছের প্রথমাংশ মিশকাত হা/৫৩৯৫)।
- [24]. বুখারী হা/৭০৩; মুসলিম হা/৪৬৭ (১৮৩); মিশকাত হা/১১৩১, ৩৪, ২৯।
- [25]. বুখারী হা/৬৫০১ ‘রিক্কাক’ অধ্যায়-৮১ ‘নম্রতা’ অনুচ্ছেদ-৩৮।
- [26]. মুসলিম হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/৪৮৯৬ ‘শিষ্টাচারসমূহ’ অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ।
- [27]. ইবনু মাজাহ হা/৩৩১২; ছহীহাহ হা/১৮৭৬।
- [28]. আহমাদ হা/২৬২৩৭; মিশকাত হা/৫৮২২ সনদ ছহীহ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়।
- [29]. ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৯; ছহীহাহ হা/১৩১।
- [30]. বুখারী হা/৫১৯০; মুসলিম হা/৮৯২ (১৮); মিশকাত হা/৩২৪৪; বুখারী হা/৫১৪৭; মিশকাত হা/৩১৪০।
- [31]. বুখারী হা/৪২১১ ‘খায়বর যুদ্ধ’ অনুচ্ছেদ।
- [32]. বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬।
- [33]. আবুদাউদ হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৫২৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৭৯।
- [34]. বুখারী হা/১২৬ ‘ইলম’ অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৪৮; ঐ, হা/১৫৮৪ ‘হজ্জ’ অধ্যায়-২৫, অনুচ্ছেদ-৪২।

[35]. তিরমিযী হা/৩৩১৫ সনদ ছহীহ ।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5769>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন